Vol. 22 | No. 2 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আদি পর্ব

Volume	22
Issue	2
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জন ভিক্টর বোল্টন
Published online	June 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v22i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i2.3
Pages	117-133
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আদি পর্ব

জন ভিক্টর বোল্টন

আধুনিক বাংলা সাহিত্য মোটামুটি দুটি কাল পর্যায়ে পড়ে। একটি মধ্য ও আধুনিক যুগের মাঝামাঝি যুগসন্ধিকাল (১৭৬৫—১৮৬২); অন্যটি যথার্থ আধুনিক সাহিত্যের কাল।

যুগসন্ধিকালে সাহিত্যের দুটি ধারা স্পষ্ট চোখে পড়ে; এক. পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ এবং রূপান্তর; দুই. পুস্তক-পুস্তিকা, গ্রন্থ, উপাখ্যান এবং শেষপর্যায়ে সামাজিক কুসংস্কার, সামাজিক শ্রেণী কিংবা ধর্মীয় সংস্থার নিন্দাসূচক কিংবা বিদ্রূপাত্মক নকশা ও উপন্যাস। প্রথম ধারার উৎস সরকারী দলিল দস্তাবেজের বাংলা অনুবাদের মধ্যে নিহিত।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করল তখন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা অনেকটা মধ্যযুগীয় ইউরোপের মতই। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যিক ভাষায় পেশাদার জীবন পরিচালিত হত। পারসী ছিল আইন ও শাসনকার্যের ভাষা, আর ধর্মাচরণ অনুষ্ঠিত হত সংস্কৃত এবং আরবী ভাষায়। একমাত্র বেসরকারী এবং গৃহজীবনেই দেশী ভাষা বাংলার প্রচলন ছিল। কোম্পানীকে বাধ্য হয়ে এ অবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। আদালত এবং শাসনকার্যের ভাষা হিসেবে পারসী বহাল থাকল; কেবলমাত্র যে সমস্ত দলিলপত্র সাধারণ লোকের জন্য আবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হত, সেগুলোই বাংলায় অনূদিত হল।

এই অনুবাদকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েই ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড বাংলা ব্যাকরণ অধ্যয়ন ও রচনা এবং স্যার চার্লস উইলকিন্স বাংলা মুদ্রণাক্ষরের নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণে উদ্যোগী হলেন। এই মনীষীদ্বয়ের প্রয়াস ফলবতী হল ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengali Language'-এর প্রকাশনায়। তখন থেকেই সরকারী অনুবাদের একটি ক্ষুদ্র অথচ নিরবচ্ছিন্ন ধারার সূত্রপাত হল।

বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার তার চেয়ে শাসনকার্যের জন্য অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজনীয় ছিল। কর্মচারীদের শাসন-কার্যের বৃহত্তর দায়িত্ব বহনের উপযোগী করে শিক্ষা দিবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। বাংলা সহ অনেকগুলো ভারতীয় ভাষার সঙ্গে, সংস্কৃত, পারসী, আরবী এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় সেকালে ইউরোপে যথার্থ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত, তার সমুদয়ই এই কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে কেরী ধর্ম প্রচারক রূপে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার আগমন ছিল প্রচ্ছন্ন এবং কয়েক বৎসর তাঁকে নীলকর হিসেবেও কাজ করতে হয়েছিল। ভারতীয় প্রজাদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে সংঘাতের সম্ভাবনা যথাসম্ভব এড়ানোর উদ্দেশ্যে কোম্পানীর তখন নীতি ছিল ধর্ম প্রচারকার্য নিষিদ্ধ করা। কেরী অবশ্য শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে ডেনিস অধিকৃত শ্রীরামপুরে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানেই তিনি বাইবেলের বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত করেছিলেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে যখন তা প্রকাশের সময় হল, তখন অন্যত্র মুদ্রণের অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য হেতু বাধ্য হয়ে নিজেই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে সেখানেই তিনি বাইবেল ছাপলেন। এই সন্ধিক্ষণে তিনি 'বাংলার ব্যাকৃসটন' স্যার চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক ছেনিকর্তন ও মুদ্রণে ট্রেনিংপ্রাপ্ত পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তা লাভ করেন। শ্রীরামপুর 'ব্যাপটিস্ট মিশন' নামে পরবর্তীকালে যা খ্যাতি লাভ করে, তারই প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কেরী পরোক্ষভাবে উইলকিন্সের মুদ্রণ ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখেন।

যথোপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের বন্দোবস্ত ও সরবরাহ ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান সমস্যা। ১৮০০ থেকে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কেরী এবং তাঁর ভারতীয় সহকর্মীগণ পুস্তক প্রণয়নের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা অক্ষুণ্ন রাখেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরী এবং তাঁর সহকর্মীগণের কৃতিত্বের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁরা কেউই সৃষ্টিধর্মী শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন বেতন-ভোগী কর্মচারী, যাঁদের কাজ ছিল নীরস এবং সাধারণ, অর্থাৎ ইংরেজদের বাংলা শেখানো। তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল কলেজের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। যদিচ এ অনুধাবন করতে গিয়ে তাঁরা সাহিত্যিক সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আদর্শের প্রয়োজনীয়তা সকল লেখকই অনুভব করেন—সে আদর্শ হচ্ছে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকারদের প্রবর্তিত সাহিত্যিক উৎকর্ষের মান। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের বাংলা গদ্যের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে কোন আদর্শেরই অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ফোর্ট উইলিয়মের বাংলা গদ্যের অগ্রদূতগণের নিকটে প্রধান সমস্যা ছিল কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের গদ্যের বাণীভঙ্গি নির্মাণ করবেন।

কেরী এদিক থেকে একটি সুবিধা লাভ করেছিলেন। ইংরেজীতে গদ্যের ঐতিহ্য ছিল; সুতরাং তিনি কি লিখবেন, সে সম্পর্কে তাঁর কিছুটা ধারণা ছিল। তাঁর প্রধান মানদণ্ড ছিল সহজবোধ্যতা। ধর্মপ্রচারক হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর লেখাকে সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের নিকট বোধগম্য করে তুলতে; এবং শিক্ষক হিসেবে চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা যেন বাঙালী সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে বাক্যালাপের ক্ষমতা অর্জন করে। তিনি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর সহকর্মী পণ্ডিতেরা যাকে 'উত্তম বাংলা' নামে অভিহিত করেন, তা জনসাধারণের নিকট অনধিগম্য। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, যদিও পণ্ডিতেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি ভাল বাংলা বলেন, তথাপি জনসভায় শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তাঁর কথা বুঝতে পারত না। সুশীলকুমার দে মনে করেন, এটা তাঁর উচ্চারণের জন্য: কিন্তু এটাই অধিকতর সম্ভাব্য যে, তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলীই এর জন্য দায়ী।

যেহেতু অত্যন্ত সংস্কৃতায়িত পণ্ডিতী বাংলাই বিদ্বান ব্যক্তির পরিচিতি চিহ্নরূপে গণ্য হত, সেই হেতু কেরীর পণ্ডিতেরা তাঁকে নিশ্চয়ই সেই ধরনের বাংলা শেখার জন্য

উদ্বুদ্ধ করে থাকবেন। কিন্তু এরূপ ভাষাকে তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে অনুপযোগী দেখে কেরী নিশ্চয় কথ্যভাষার দিকে ঝুঁকে পড়তেন, যদি তা পণ্ডিতদের নিকট অশোভন তিরস্কারের ভাষারূপে নিন্দিত না হত। সে সময়ে সম্ভবতঃ ব্যাপারটা সেই রকমই ছিল। পণ্ডিতেরা যথার্থ যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, ভাষায় সামাজিক মর্যাদা প্রতিফলিত হয় এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাণীভঙ্গির পরিপূর্ণ সংগতি থাকে। ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্রের মত গুরুগম্ভীর বিষয় সমুন্নত বাণীভঙ্গির দাবী করে। অতিরিক্ত সংস্কৃতায়িত পণ্ডিতি ভাষাই যে ঐতিহ্যগতভাবে সমুন্নত বাণীভঙ্গির দ্যোতক, বাংলায় রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' এবং আলাওলের 'পদ্মাবতী' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে কথ্যভাষা বড় জোর কেবল অশিষ্ট উপাখ্যান এবং গল্পের পক্ষেই উপযোগী।

কেরী অবশ্য এই ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাননি। তাঁর নিজের ঐতিহ্য ছিল অন্য প্রকার। তিনি সাধারণ পরিবার থেকে উদ্ভূত, স্বয়ং-শিক্ষিত ইংরেজ প্রটেস্টাণ্ট। ধর্মপ্রচারক হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন মুচি। সুতরাং কেরী এবং তার পণ্ডিতদের ঐতিহ্য ছিল পরস্পর বিপরীত। ভারতে শিক্ষা এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্র চর্চা কেবল মাত্র ভদ্রমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং পাণ্ডিত্যময় বাণীভঙ্গির ব্যবহার সেখানে অযথার্থ ছিলনা। প্রটেস্টাণ্ট ইংল্যাণ্ডে অবশ্য শিক্ষা এবং ধর্মশাস্ত্র চর্চা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হত। কথ্য সরল বাণীভঙ্গি সেজন্য ছিল অপরিহার্য।

ভাষা এবং স্টাইলের ক্ষেত্রে কেরী এবং তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিরোধিতা ঠিক এইভাবেই কখনো অভিব্যক্তি লাভ করেছিল কিনা তাতে সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু বিরোধিতা যে ছিল তা তাঁদের স্ব স্ব প্রবণতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কেরী প্রধানতঃ চলিত ভাষার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলেন; এবং কখনো তা এত কথা সম্বলিত যে তাকে সাধু ভাষা বলাই কঠিন; এবং তাঁর পণ্ডিতেরা রচনায় এমন দুরূহ সাধু ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন যে তা বুঝাই দুষ্কর।

কেরীর ব্যর্থতা তাঁর অনুবাদের সাহায্যে এবং পণ্ডিতদের বিফলতা সাদৃশ্যের সহায়তায় প্রদর্শন করা যেতে পারে। পণ্ডিতদের স্টাইল আধুনিক আইনজ্ঞদের মত, যা শুধু তাঁদের নিকটই বোধগম্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট তা দুর্বোধ্য। কেরীর স্টাইলে রুচির শোচনীয় ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'প্রেম করা' শব্দটিকে তিনি খ্রীস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শব্দটি যৌন অর্থে ভালবাসা বুঝায়। তদুপরি তাঁর 'কথোপকথনের' কিছু কিছু সংলাপ নিতান্তই অশালীন। সেগুলো স্পষ্টতই তাঁর হিন্দু সহকর্মীদের রচিত, কারণ, কেরী কর্তৃক সে-গুলোর ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে না।

> 'তোর যে বড় গলারে ভাই খাদী। আজি তোর অহংকার
> ভাঙ্গিতে হবেক। তাহা নাহিলে তুই নিরস্ত হবি না।
> আজি তুই আমারে নিরস্ত না করিয়া যদি ভাত
> খাইস তবে তোর পুত্তের মাথা খাইস।
> শুনিতে পাও তোমরা গো-রাক্ষসী খানকির কথা এমত
> রাক্ষসীর মুখে আগুণ দেওয়া ওচিত।
> তুই মুখ সামলাইয়া বলো। আজি তোর ভাল রাতি
> পোহায় নাই। বলিতেছি তোরে।
> আমার ভাল রাতি পোহায় নাই কি তোর দেখিস এখন
> নাথিয়া তোর মুখ খেথুয়া করিব, তখন জানিবি।'[১]

এমন কি বর্তমান কালেও এই সংলাপ অশালীন বলে বিবেচিত হবে। তথাপি এইটি এবং অন্যান্য সংলাপ সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করে যে, ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের মত সময়েও নিখুঁত উচ্চারণ সমন্বিত প্রাণময়, শক্তিমান বাংলা লেখা সম্ভবপর ছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে হিন্দু পণ্ডিতদের অনমনীয়তা এর সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এইরকম অকৃত্রিম সংলাপ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিস্ময়কর গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের পূর্বে আর দেখা যায় নি।

তথাপি, কেরীর 'কথোপকথনে'র (১৮০১) ভাষায় স্টাইল-বৈচিত্র্য এবং মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষাভঙ্গি এটাই নির্দেশ করে যে, উনিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকের লেখকরাও বাংলার সহজাত বাণীভঙ্গির সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

এই প্রথম দিকের রচনাবলীতে কথ্য ও সাধু স্টাইলের যে বিরুদ্ধতা দেখা যায়, তা প্রায় সমগ্র উনিশ শতক পর্যন্ত চলে যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাধান সাহিত্যিক উভয়ের সমন্বয় সাধন করেন।

পরবর্তী কালে যা ঘটবে রাম রাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় তার অধিকাংশই পূর্ব সূচিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ই প্রথম সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ও রূপান্তরের সূত্রপাত করেন 'হিতোপদেশ' এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণাবলীবর্ণনা-সূচক বত্রিশটি গল্পের গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' সংকলন করে। মধ্যযুগের বাঙালী রাজা প্রতাপাদিত্যের আংশিক ঐতিহাসিক এবং আংশিক ঔপন্যাসিক বর্ণনামূলক রাম রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথ প্রদর্শক। স্বদেশানুরাগের জন্য এই ধরনের বই যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। বৃত্তি, শ্রেণী এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে নিজ নিজ পরিবেশে সংলাপরত বহু বিচিত্র দৃশ্য সম্বলিত বাংলা সমাজ কেরীর 'কথোপকথনে' মূর্ত হয়ে পরবর্তীকালের নক্সা এবং উপন্যাসের আবির্ভাব সূচনা করে। অধ্যাপক ক্লার্কের এই যুগের আলোচনার উপসংহার সংগত এবং সমুচিত :

> 'Carey, Rám Ram Basu and Mrtunjay contributed to Bengali literature prose narrative and conversation, (and) the embryo of the novel and short story that were to come : and they did it with the minimum of raw material to hand. It has been given to few builders to make such solid bricks with so little straw'২

ইউরোপীয় ধর্ম প্রচারকগণ, বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুবাদের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে থাকেন। ভার্জিলের 'এনিড', শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট,' 'রবিন-সনক্রুশো,' 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস,' ল্যাম্বের 'শেক্সপীয়রের গল্প' ইত্যাদি কেবলমাত্র উপন্যাসমূলক নয়, অস্থিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থও অনূদিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পর এই ধারা আরো সম্প্রসারিত হয়।

অপরিহার্যভাবেই এই ধারা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) প্রমুখ বাঙালী লেখকদের অবদানে সমৃদ্ধ। এই তিনজনের প্রধান রচনাবলীই অনুবাদ, অনুসরণ এবং অন্য থেকে সংগৃহীত তথ্যের সংকলন, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ রচনায় স্বকীয় ব্যাখ্যা এবং মূল্যবোধ আরোপের চেষ্টা করেছিল।

এই ধারায় রামমোহনের অবদান হচ্ছে, বাংলায় সংস্কৃত বেদান্ত সূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), সেই গ্রন্থেরই সার সংকলন 'বেদান্তসার' (১৮১৫) এবং পঞ্চ উপনিষদ—কেন, ঈশ, কথা, মাণ্ডুক্য এবং মুণ্ডক (১৮১৬—১৮১৬)।

এই সমস্ত অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রদর্শন করা যে, হিন্দুশাস্ত্র আকার এবং প্রতীক বিহীন একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনাই অনুমোদন করে; সেই হেতু প্রচলিত পৌত্তলিকতা শাস্ত্র সঙ্গত নয়। অতএব সেগুলো রহিত করা অবশ্যকর্তব্য।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের পরে তিনি কতকগুলো ধর্মোপদেশ এবং খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরমালা প্রকাশ করেন। তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী হচ্ছে, তের খণ্ডে প্রকাশিত কীর্তিস্তম্ভ তুল্য বাংলা মহাকোষ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬—১৮৫১), তাঁর Dialogues on Hindu philosophy, (১৮৬১) গ্রন্থের বাংলা রূপ 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৬২), এবং 'Arian Witness' (১৮৭৫)।

মহাকোষ প্রণয়নের পশ্চাতে কৃষ্ণমোহনের আকাঙ্ক্ষা ছিল পাশ্চাত্য কলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচারের দ্বারা তাঁর স্বদেশী লোকদের নৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করা। খ্রীস্টধর্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব, বিভিন্ন হিন্দু দার্শনিক পদ্ধতির আলোচনামূলক 'ষড়দর্শন সংবাদের' নিরপেক্ষতাকে ব্যাহত করেছে। এই নিরপেক্ষ দৃষ্টির অভাব বহুলাংশে তাঁর রচনার মূল্য হ্রাসের জন্য দায়ী। 'Arian Witness' -এ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বাইবেলে যা পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে, ভারতীয় আর্যদের বেদে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। কৃষ্ণমোহনের মতে প্রজাপতির আত্মবিসর্জন যীশু খ্রীস্টের আত্মদানের ইঙ্গিত বহন করে।

অক্ষয়কুমার দত্তের খ্যাতি তিনখানা গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত; এগুলো ন্যূনাধিক সমসাময়িক ইংরেজী গ্রন্থের অনুসরণে রচিত।

১. 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (দুই খণ্ড : ১৮৫১ এবং ১৮৫২)—জর্জ কম্বের 'constitution of man' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

২. 'চারুপাঠ'—ইংরেজী উৎস থেকে গৃহীত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংকলন; এ গ্রন্থের কতকগুলো প্রবন্ধ পূর্বেই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'—(দুই খণ্ড : ১৮৭০ এবং ১৮৭১), এইচ. উইলসনের 'Religious Sects of the Hindus' গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত হলেও অক্ষয়কুমারের নিজস্ব গবেষণায় বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ।

বিজ্ঞান এবং ধর্ম মূলত: যে একই বস্তু, অক্ষয়কুমারের এই কেন্দ্রীয় চিন্তা Combe থেকেই আহৃত। স্রষ্টার আইন প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই বিধান; এই নিয়মকানুনসমূহের পালন মানুষের উপকার করে এবং তাদের লঙ্ঘন তার ক্ষতির কারণ হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যানুসন্ধানের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, অক্ষয়কুমারের নিকট তাই ধর্মীয় পাঠ্যবস্তু। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এ তিনি মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, সুপ্রজনন বিদ্যা, দীর্ঘজীবন লাভ এবং পথ্যাদি সম্পর্কে এইসব নিয়ম-কানুনের প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।

স্টাইলের দিক থেকে এই ধারায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০—১৮৯১)। অন্য তিনজন অপেক্ষা তাঁর বাণীভঙ্গি অবাধ স্রোতধারার ন্যায় সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। লোকে তাঁর লেখা পাঠ করে নৈতিক আলোকপ্রাপ্তির জন্য নয়, সাহিত্যিক আনন্দ লাভের জন্য। শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে রচিত তাঁর 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৮) মৌলিক বাংলা রচনার মত লাগে। আজ পর্যন্ত বোধ হয় এটাই বাংলায় শেক্সপীয়রের সর্বাপেক্ষা সার্থক রূপান্তর। তাঁর 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) এবং 'সীতার বনবাস'ও (১৮৬০) উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। শিশিরকুমার দাস 'সীতার বনবাস' সম্পর্কে বলেন :

> 'Vidyasagar - - - has the capacity of the novelist to keep the action moving and to hold the reader's attention, form chapter to chapter. For this reason the book must be regarded as important in the early history of the Bengali novel. For, though 'Sitar Banabas' cannot strictly be called a novel, it has certain qualities which were later developed by and became popular Bankim chandra. Perhaps it is in his characterisation that Vidyasagar is at his greatest. In the presentation of Ram and Sita he departs form the Bengali tradition which was first established by Krittibas in his Ramayan. Kritibash's Ram, particularly after the defeat of Raban, has few commendable qualities. A reader feels that he has quite unnecessarily subjected Sita to great hardship. Vidyasagar is unable to change the story or to prevent Sita's exile, but he creates a conflict in the mind of Ram in which the love of a man and the duty of a king are in direct opposition. By doing this convincingly, he rehabilitated, Ram to the extent that he as well as Sita is an object of readers sympathy.'[৩]

বিদ্যাসাগরের স্টাইলের সাবলীলতা এবং সংলাপ ও বর্ণনার সমন্বয় দক্ষতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি :

'সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা। মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞ দর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণ-পত্র আনিয়া ছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা। এক বিষয়ে আমরা যারপর নাই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্মিণী কে হইবেন। সে বলিল, যজ্ঞ সমাধানের জন্যে বশিষ্ঠ দেব পুনরায় দার পরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই, সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়াছে, সেই প্রতিকৃতি সহধর্মিনীর কার্য নির্বাহ করিবেক।'[৪]

এই অনুবাদ এবং অনুসরণে রচিত পাঠ্যপুস্তকের ধারা সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে বাংলার উন্নয়নে প্রভূত সহায়তা করেছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য নতুন শব্দ নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন ভাষার শব্দকোষ সমৃদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে

বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য গ্রন্থাদি রচিত হওয়ায় তেমনি বিষয়ের পরিধিও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ তুলনামূলকভাবে স্বল্পসংখ্যক লোকের নিকটই সহজ লভ্য ছিল। প্রথমতঃ, প্রকাশনার ব্যয় বাহুল্য ; দ্বিতীয়তঃ, এগুলো বহুলাংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। সুতরাং আমরা এখন যে দ্বিতীয় ধারার আলোচনা করব, তা নিম্নলিখিত কারণে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, সাময়িক পত্রে প্রকাশের ফলে এ সাহিত্য অধিক সংখ্যক পাঠকের নিকট সহজলভ্য ছিল ; দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম ও সমাজ এদুটি বিষয়ের মধ্যে এর আলোচনা নিবদ্ধ হওয়ায় এটা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতীয় সমাজের অন্ততঃ একটি শ্রেণী উপকৃত হয়েছে ; এবং সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। এঁরা অধিকাংশই হিন্দু । প্রায় দুই শতাব্দীর অধিক কাল ধরে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ব্যবসায়ে এরা অভ্যস্ত হয়েছেন। ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে এঁরা ব্যবসা করেছেন। ব্রিটিশ শাসন এঁদের কাছে কোন স্বতন্ত্র বস্তু ছিলনা। এঁরা আগের মতই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করতে লাগলেন। অনেকে আবার কোম্পানীতে চাকুরিও গ্রহণ করলেন। ইংরেজদের সঙ্গে যৌথ অংশের ভিত্তিতে কেউ কেউ নতুন কোম্পানীও গড়ে তুললেন। এভাবে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করলেন। এঁরা হলেন কলকাতার নতুন ধনিক সম্প্রদায়। ভূমি রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের ব্রিটিশ নীতির কল্যাণে এঁদের অনেকে জমিদারী কিনে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অর্জন করলেন। অভিজাতদের সঙ্গে সমাজের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটা তাঁদের সামর্থ জোগাল।

এই শ্রেণীর কাছ থেকেই ইংরেজী শিক্ষার দাবী উঠল। এই ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের পুত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা তাঁদের নব অর্জিত সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে বজায় রাখতে পারেন।

ভারতীয় ছেলেদের জন্য প্রথম ইংরেজী শিক্ষায়তন হিন্দু কলেজ। ডেভিড হেয়ার এবং তাঁর ভারতীয় সহকর্মীগণ কর্তৃক ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়ার দিকে জনসাধারণের চাঁদাতেই এর ব্যয় নির্বাহ হত। ছাত্রদের ভর্তির চাহিদা ছিল বেশী, ফলে অল্পকালের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াল চারশো-তে।

এটা মনে রাখা দরকার যে কোম্পানী তখন পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার কর্মচারীদের প্রাচ্যভাষাসমূহ শিখিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় একটি মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কারণ, যদি ইংরেজরা পারসী এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকতেন এবং পারসীকে সরকারী ভাষা হিসেবে চালু রাখতেন, তাহলে তাঁদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত সন্তানদের জন্য চাকুরীর কতক নিয়োগ ক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যেত।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে গবর্নমেণ্ট একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সংস্কৃত কলেজ নামে খ্যাত এই শিক্ষায়তন প্রকৃত পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উপলক্ষে রামমোহন রায় ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের নিকট একখানা পত্র লিখেন :

> 'This seminary can only be expected to load the minds of youth with grammatical nicetis metaphysical distincitions of little or no practical use to the possessor or to society. The pupils will acquire what was known two thousand years ago, with the adition of vain

and empty subtleties since produced by speculative men..I beg your lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge since he wrote. If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconion philosophy would not have been allowed to replace the system of the school men..In the same way the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature.'

রামমোহন এখানে ভাষা পরিস্থিতির অযথার্থতাকে উদঘাটন করেছেন। ভাষার মূল্য তার সংস্কৃতির দ্বারাই নির্ণিত হয়; কেননা সংস্কৃতিতে প্রবেশের চাবিই হচ্ছে ভাষা। ইউরোপে গ্রীক এবং ল্যাটিনের গুরুত্ব অধিকতর, কেননা এদুটি ভাষার সাহায্যে ইউরোপীয়রা বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে উন্নততর সংস্কৃতিতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেছে। রামমোহনের কথা এদিক থেকে সত্য যে, রেনেসাঁসের পর থেকে গ্রীক এবং রোমের সংস্কৃতিকে ইউরোপ প্রধানতঃ অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণার দ্বারা আরো সমৃদ্ধ এবং উন্নত করেছে। রামমোহন চেয়েছিলেন বাঙালী হিন্দু যুবকদের সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ক্ল্যাসিকাল জ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগে পশ্চাৎমুখী না করে, ইংরেজীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের নতুন বৈজ্ঞানিক যুগে এগিয়ে নিতে।

রামমোহন যখন ধর্মসংক্রান্ত বাদানুবাদ এবং বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশের কোঠায়। বুদ্ধিবৃত্তি এবং মননশীলতায় তিনি তখন পরিপক্ক। তিনি নিজে ছিলেন বিচক্ষণ এবং বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যবসায়ী, এবং এমন একটা শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, মুসলমান আমলে যার সমৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু ব্রিটিশ আমলে যার উন্নতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। রামমোহন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। প্রথম, ব্রিটিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করা উচিত; দ্বিতীয়, ব্রিটিশ সংস্কৃতি এদেশের বিদ্যালয়ে পঠিত হওয়া উচিত; এবং তৃতীয়, ইংরেজী উচ্চশিক্ষার, শাসনকার্যের এবং আদালতের ভাষা হওয়া কর্তব্য। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, রামমোহনের ইচ্ছা ছিল, শাসন যেন মুসলমান শাসনের মত রূপ নেয়। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কতকগুলো নির্দিষ্ট সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারের জন্য আন্দোলন করতে।

'সহযোগিতা' কথাটি একটি নিন্দিত অর্থ বহন করে যার মানে স্বদেশানুরাগের অভাব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে 'সহযোগিতা' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি ইংরেজ রাজত্ব মুসলমান শাসনের মত রূপ ধারণ করত, তাহলে ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবেই থেকে যেত। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এবং রামমোহনের মত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে ভারতবর্ষের লোকেরা তাঁদের রাজনৈতিক ভাগ্যের পরিচালনায় অধিকতর ক্ষমতা লাভ করতেন এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং রক্তপাত ব্যতিরেকেই এখন তাঁরা যে মর্যাদা ভোগ করছেন তাই লাভ করতেন। সুতরাং রামমোহনকে প্রথম শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমিক এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা উচিত।

রামমোহন হিন্দু ছিলেন। সারাজীবন তিনি হিন্দু থাকবারই প্রয়াস করে গেছেন। ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করেই তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো ধর্মান্ধ হিন্দু ছিলেন না। হিন্দু ধর্মই একমাত্র সত্য এবং অন্য সমস্ত ধর্ম মিথ্যা, একথা তিনি

বিশ্বাস করতেন না। তিনি খ্রীস্টান চিন্তাধারার প্রতি বহুল পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যে খ্রীস্টান নীতিশাস্ত্রকে তিনি প্রশংসা করতেন তার ব্যাখ্যা করে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'Precepts of Zesus' রচনা করেন। কিন্তু খ্রীস্টান ত্রিত্ববাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে রক্ষণশীল খ্রীস্টানদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই বিরোধ বিতর্কের আকারে বাংলা সাময়িক পত্রিকায় চলতে থাকে। অন্যদিকে বহুত্ববাদী পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের সঙ্গেও তিনি আপোষ করতে পারেননি। এর ফলে আর একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

রামমোহনের চিন্তার কেন্দ্রীয় ধারণা হচ্ছে সব ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদ ভিত্তিক। বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি যে একেশ্বরবাদ আরোপ করেন, তা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল। পরে তাতে খ্রীস্টান একত্ববাদের স্পর্শ বুলিয়ে দেন। ফলে শিশু জগতের স্রষ্টা ও অধিপতি 'ব্রহ্মা' নামে যে ঈশ্বরের উপাসনা তিনি প্রবর্তন করেন, তা হিন্দু ধর্মের 'ব্রহ্মা' মুসলমানদের 'আল্লাহ' এবং খ্রীস্টানদের 'গড'—তত্ত্বের উপাদান থেকেই গৃহীত। তিনি 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সেখানে সকল ধর্মের ও মতের এবং সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোক সামাজিকভাবে মিলিত হয়ে নিজের মতে উপাসনা করতে পারত। শুধু অন্য ধর্মের অবমাননা করা এবং মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ ছিল।

সুতরাং এটা বুঝা যায় যে রামমোহন একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং বিশুদ্ধ হিন্দু ছিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার ভাব সৃষ্টি করা এবং কতকগুলো ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার কার্যকরী করা। সবগুলোই তাঁর বিশ্বাসের মহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যাতে করে এমন একটি সমাজ গঠিত হবে যেখানে সকলে মনে করবে তারা প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তারা নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করবে। অন্য কথায় তাঁর স্বপ্ন দৃষ্টি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের।

রামমোহনের এই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকাংশ লোকই রামমোহনের মত বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। হিন্দু সমাজ তিনটি বিবাদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—রামমোহনের অনুসারী মধ্যপন্থী দল, হিন্দু কলেজের প্রগতিপন্থী দল এবং গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল দল যাঁরা আধুনিক বাংলার অশান্ত সামাজিক দৃশ্যাবলীকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন।

মধ্যপন্থীরা ছিলেন বয়সের দিক থেকে পরিণত এবং অনেকেই শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং সকলেই হিন্দু সমাজে মেয়েদের মর্যাদা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সতীদাহপ্রথা নিরোধ, বিধবাবিবাহ এবং নারীশিক্ষাসহ সীমিতভাবে নারী-মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

নিম্নোদ্ধৃত অংশে রামমোহন সেকালে বাংলাদেশে নারীদের সম্পর্কে যে-সমস্ত কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তার কিয়দংশ খণ্ডন করছেন :

'প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সংগত হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা

বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব-শাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে অস্থিরান্তকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃত প্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে-তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

... চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক২ পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহবা যাবজ্জীবন অতি কষ্টে যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি এই সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পতিগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটিতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায়?

বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকাল কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম ক্রিয়া থাকে, এবং সুপ্রকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে...অই রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষজনকপূর্বক আহার করিয়া কাল-যাপন করে।

এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপন কারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করাও হইতে রক্ষা পায়।'৬

'সতীদাহ' বা স্বামীর চিতায় হিন্দু বিধবার আত্মহত্যার বিরুদ্ধে রামমোহনের যে আন্দোলন, এই বক্তৃতা তারই অংশ বিশেষ। সতীদাহ রহিত হয়ে গেলে সমস্যা হবে বিধবাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহের ব্যাপার। এর সর্বোত্তম সমাধান তাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা, কিন্তু হিন্দু সমাজ এর বিপক্ষে। অতএব মধ্যপন্থীদের পরবর্তী কর্মপন্থা হচ্ছে বিধবাবিবাহের প্রতিরোধকে ভেঙ্গে ফেলা। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের পরিমিত বাগ্মিতার নিদর্শন উদ্ধৃত করছি:

'যাহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না ও পাতক দেখিয়া অশ্রদ্ধারও আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে, ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিনকালে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?" যিনি কোন নববিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যমৃত প্রিয়পতির শোক মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?" যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্বে স্বামিসমাদরে মানিনী ও গৌরবিনী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়হীনা হইয়া দীনভাবে, শীর্ণ শরীরে, সাশ্রুনয়নে, দিনপাত করিতেছে, এবং স্বামী সম্পর্কীয় বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাস দাসীগণ কর্তৃক উপেক্ষিত ও অশুদ্ধিত হইয়া কাতরস্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যে রূপবান যুব পুরুষ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, লোকজন দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত, গৃহমধ্যে উৎসব ব্যাপারে সতত ব্যাপৃত, সেই ব্যক্তিকে যিনি অতি বালবিধবা অনাথা দুহিতার প্রিয়মান মুখচন্দ্র সহসা স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অধসনু হইতে, এবং চির প্রদীপ্ত সুদারুণ শোক-শিখা সদৃশ ভয়ঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে, দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে পবিত্র কুলে কোনকালে কলঙ্ক-স্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই, সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃকুল, মাতৃকুল, ও ভর্তৃকুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রূণ বধ জনিত অশুদ্ধ শোণিত সংস্পর্শে লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচগ্রস্ত করিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" কোন পতিবিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথি বিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ করিল না। জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া, দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া, প্রাণ-ত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?'[৭]

এখানে দেখুন বিদ্যাসাগরের মনোবেদনার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ :

'তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধ হয় না দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধান দোষে সংসার তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই কর্ম ও পরম ধর্ম আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।'[৮]

মধ্য পন্থীরা তাঁদের সমস্ত সংস্কারকে আইনে বিধিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন : সতীদাহপ্রথা রহিত হয়েছিল; বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হয়েছিল; নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের দিক থেকে এর সাড়া ছিল নগণ্য। এই ধরনের সমাজসংস্কারের প্রেরণা এদেশে হয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসে, নতুবা আদৌ আসে না।

প্রগতিপন্থীরা হিন্দু কলেজ থেকে উদ্ভূত পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাবু। ফরাসী বিপ্লব এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা প্রভাবের আতিশয্যে এই তরুণদের অনেকেই মানস-মুক্তিকে সামাজিক স্বেচ্ছাচারের অনুমতিপত্র ভেবে এবং কোম্পানীর কতিপয় কর্মচারীর অনাচারকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সদগুণাবলী মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ রূপে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। অন্যান্যরা হিন্দু ধর্মের সমস্ত বিধি নিষেধ ভঙ্গ করেছিলেন—মদ্যপান, মুসলমানের প্রস্তুত রুটি এবং গোমাংস ভক্ষণ করেছিলেন। এমন কি এদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গোমাংসের টুকরো তাঁর প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে কৃষ্ণমোহনকে সমাজচ্যুত হতে হয় এবং তিনি ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য হন।

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংরেজীতে 'Persecuted' নামে একখানা নাটক রচনা করেন। এতে তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভণ্ডত্ব ও ধর্মান্ধতাকে উপহাস করেছেন। একটি দৃশ্যে গোপনে মদ্যাসক্ত দুজন ব্রাহ্মণের চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। তাদের ঘোষণা :

> 'The Brahmin is a blessed name ! He tramples upon the very persons whose bounty feeds him. May things remain forever as thay are now, and may we thus subsist upon the clever tricks we play upon the Hindus.'৯

কৃষ্ণমোহন মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, শিক্ষাই নারীকে নীচ গৃহকর্ম ও স্বামীর দৈহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির যোগানের কার্য থেকে মুক্তি দিতে পারে। মোটের উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একজন ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানের ; যার ফলে হিন্দুসমাজের কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কৃষ্ণমোহন প্রকৃত পক্ষে আলেকজাণ্ডার ডাফ কর্তৃক ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন।

রক্ষণশীল দল পুরাতন সুন্দর দিনের পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁরা আধুনিকতার প্রতি বিদ্রূপময় পাণ্ডুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কমবেশী ১৮১৭—১৮৩৩ এই সময়ের মধ্যে যখন রামমোহন খুবই কর্মতৎপর—সেই সময়েই তাঁদের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল রামমোহনের মত পাশ্চাত্যশিক্ষিত এবং বাঙালী ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞাশীল ধনিকশ্রেণীর সন্তানেরা।

এখানে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক যথার্থ (typical) বাবুর প্রতি উপহাস লক্ষণীয় :

'বাবু লেখাপড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্বশাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এ সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালীর ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিক্ষা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কর্মসকলও করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল।
বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিংবা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ানো।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুমচক্ষে ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এইক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্যপথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠ হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাই গাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন।'[১০]

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ভবানীচরণ তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণ সম্পর্কে প্রদেশের জনসাধারণকে অবহিত করা। কারণ,

'পল্লিগ্রামনিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোকসকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার-বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্যভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্যন্যায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তর ভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রামনিবাসী ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রামনিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথায় প্রয়োজন নাস্তি।'[১১]

গ্রন্থখানি কথোপকথনের আকারে লিখিত। এতে একজন শহরবাসী মফঃস্বল বাসীকে কলকাতার জীবন সম্পর্কে অবহিত করছেন। এই পদ্ধতি রক্ষণশীলতার সদাচারের প্রশংসা ও অরক্ষণশীলতার অনাচারের বিদ্রূপের জন্য সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ মফঃস্বলবাসী সরলভাবে অনুসন্ধান করছেন :

'অত্যন্ত অপূর্ব শিষ্ট শান্ত মহাশয়রা অশৌচ সময়ে শুদ্ধাচারার্থে কেবল ব্রাণ্ডি মাত্র পান করেন অন্য সময়ে আহার বাজারের পাক করা মাংস মিঠাই ও মুসলমান কৃত পাঁওরুটি এবং নানা প্রকার সরাপ ইত্যাদি দ্রব্যসকল ভোজন করেন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক ধুতি প্রভৃতি বস্ত্র পরিত্যক্ত করিয়া ইজার জামা জোড়া ইত্যাদি পরেন।'[১২]

ঘটনাক্রমে রামমোহন রায় একাধিকবার এ সবের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। যাহোক, এসব কথার পর মফঃস্বলবাসীকে বিনীতভাবে বলা হল যে এ সমস্ত আচরণ ভদ্রলোকের নয়।

যে সকল লোক বিস্তর বই কেনেন কিন্তু আদৌ পাঠ করেন না, ভবানীচরণ তাঁদেরকেও বিদ্রূপ করেছেন :

'বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহবা দুই গেলাসওয়ালা আলমারারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণীপূর্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে

পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদার ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোন কালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না—এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ তাহাতে করেন না।'[১৩]

এই সকল বিদ্রূপাত্মক রচনার পটভূমিকা অধ্যাপক ক্লার্কের ভাষায়—"Calcutta with its crowded, noisy and ill scavenged streets" নিম্নোদ্ধৃত অংশে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই দৃশ্যেরই জরিপ করছেন :

> 'রাস্তার ধারে ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতড়ির উপর মাছি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের মত দ্যাখাচ্চে,—কুটিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো!
>
> "চারআনা।" "চারআনা"! "লালদিঘী"! "তেরজুরী!" "এসো গো বাবু ছোট আদালত!" বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে,—নবদ্ধাগমনের বউয়ের মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আছেন—সঙ্গী জুটচেনা। দুই একজন গভর্ণমেণ্ট অফিসের ক্যারাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেছেন,—গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে তবে ঝঁকামুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ী চড়া কর্ম নয়! কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্চে।'[১৪]

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮)-ও একই প্রতিবেশ বিরাজমান। তাঁর লেখনীও একই ধরনের বাবুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু তথাপি উক্ত গ্রন্থে এমন কতকগুলো অংশ আছে, যেখানে প্যারীচাঁদ তৎকালীন সামাজিক দুষ্কৃতিকে কখনো লঘু বিদ্রূপ কখনো বা গভীর মর্মবেদনার সাহায্যে প্রতিফলিত করেছেন। এতে বুঝা যায় এ সকল ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির যোগ ছিল। অর্থ লোলুপ কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহ এই রূপ একটি কুপ্রথা। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ক্ষুদ্র কিন্তু তাতে বহু কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বক্তা এখানে একজন তরুণী স্ত্রী :

তবে শুনবে? আর বৎসর যখন আমি পালা জ্বরে ভুগতেছিনু—দিবারাত্র বিছানায় পড়ে থাকতুন—উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়ে মানুষের স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম দুই দণ্ড কাছে বসিয়া কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বল্লে প্রত্যয় যাবে না—তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বললেন—ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছি—তুমি আমার একস্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকটে আসিতেছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বললাম তিনি তো ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বল্লাম মাকে

জিজ্ঞাসা করি—মা যা বলবেন তাই করবো। একথা শুনিবামাত্রে আমার হাতের বালা গাছাটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়া-বাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হয়্যে পড়েছিনু, তারপর মা আসিয়া আমাকে বাতাস করাতে আমার চেতনা হয়।'১৫

অন্য দুটি সংক্ষিপ্ত অংশ ও তাৎপর্যপূর্ণ :

১. 'মেজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে নীলকর ইংরাজ; খ্রীস্টীয়ান—মন্দ কর্ম কখনই করিবেনা—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম করে।'১৬

২. 'জমিদার ও নীলকরকে জব্দ করিবার জন্য দুই উপায় আছে—প্রথমতঃ মৌলবী সাহেবের মতন লোকের আশ্রয় লওয়া—দ্বিতীয়তঃ খ্রীস্টান হওয়া। আমি দেখিয়াছি অনেক প্রজা পাদরির দোহাই দিয়া গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়। পাদরি সাহেব কড়িতে বল—সহিতে বল—সুপারিসে বল "ভাই লোকদের" সর্বদা রক্ষা করেন। সকল প্রজা যে মনের সহিত খ্রীস্টান হয় তা নয় কিন্তু যে পাদরির মণ্ডলীতে যায় সে নানা উপকার পায়।'১৭

এখানে কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ নীলকরের শোষণ এবং খ্রীস্টান ধর্মের দীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই উভয় অনুচ্ছেদের তাৎপর্য পরে বোঝা যাবে।

মধ্যপন্থী, প্রগতিপন্থী এবং রক্ষণশীল এই তিনটি দলের শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল গভীর।

মধ্যপন্থীরা রামমোহনকে অনুসরণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভা'কে তাঁরা 'ব্রাহ্মসমাজে' পরিণত করেন। সমাজ রামমোহনের মনোনীত 'ঈশ্বর' 'ব্রহ্মা'র উপাসনায় উৎসর্গীকৃত, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারকদের ধর্মান্তরিতকরণের উৎসাহে তা কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। 'ব্রাহ্মসমাজ' সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হয়ে পড়ে এবং খ্রীস্টানদের প্রতিরোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত গোঁড়া হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ব্রাহ্মসমাজের মুখ-পত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় স্বদেশপ্রেমের সুর ধ্বনিত হয়; যেমন :

'এখনও সকলে সতর্ক হউন, স্নেহের সহিত স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যাহাতে স্বদেশানুরাগ সকলের মনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে তাহার আন্দোলন করিতে থাকুন। স্বদেশানুরাগই স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান উপায়। স্বদেশানুরাগ ব্যতিরেকে স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা আর কৃত্রিম শোকে অভিভূত হইয়া নাটকের অভি-নয় করা উভয়ই তুল্য।'১৮

খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের জবাব স্বদেশপ্রেম, সুতরাং হিন্দু সমাজে স্বদেশপ্রেমের অর্থ সংকীর্ণ হয়ে দাঁড়াল খ্রীস্টান ধর্ম এবং পাশ্চাত্যীকরণের বিরুদ্ধতা ও হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রচার।

হিন্দু প্রগতিপন্থীরা ছিলেন রক্ষণশীলদের অপেক্ষা তরুণ; তাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ইংরেজীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন; ফলে তারা বাংলা

অপেক্ষা ইংরেজীতে অধিকতর সোচ্চার ছিলেন ; এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁদের জ্ঞান তুলনামূলকভাবে বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা গভীর ছিল। তাঁরা বাংলা পড়তেন না, কারণ তাঁদের মতে 'বাংলায় পড়বার মত কিছুই নাই'। তাঁরা বায়রন, স্কট, ওয়ার্ডসওর্থ, কীট্‌স এবং শেলীর রোমান্টিসিজমে অনুরঞ্জিত ছিলেন। এক কথায়, সেকালে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরা তাই হয়েছিলেন, অর্থাৎ বর্ণ ও রক্ত বাদ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ।

তাই তরুণদের অনেকেই ইংরেজীতে সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনায় সম্ভবত: এই মনোভাবই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন :

I sigh for 'Albion's distant shore,
Its valleys green, its mountains high,
Though friends relations I have none
In that far clime ! Yet oh I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless grave ![১৯]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাইকেল মধুসূদনের মত কেউ কেউ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি একটা দুঃখজনক ঘটনা। কারণ, রামমোহন দেখেছিলেন খ্রীস্টান ধর্মের মত হিন্দুত্বও একটি মহৎ ধর্ম। উভয়ের মধ্যেই অসংগতি আছে এবং সম্ভবত: উভয়ের কোনটারই সত্যের উপর নিরঙ্কুশ দাবী নাই। কিন্তু একজন বাঙালী হিন্দুর জন্য দুই ধর্মের মধ্যে হিন্দু ধর্ম নিঃসন্দেহে অধিকতর উপযোগী ; কারণ এটি কেবল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই যুক্ত নয়, দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত। ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁদেরকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তার পরিমাণ অনেক বেশী : বন্ধু এবং পরিবার পরিজন থেকে নির্বাসন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছেদ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা। তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশে মধুসূদনের জীবন বিদেশের ভূমিতে নির্বাসিত জীবন অপেক্ষা কোনক্রমেই সুখদায়ক ছিলনা।

ইংরেজ রাজত্ব মুসলিম শাসনের মত রূপ গ্রহণ করবে—রামমোহনের এই ধারণা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। মুসলমানরা এক সামন্ত অর্থনীতি থেকে অন্য সামন্ত অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন সুতরাং মুসলমানদের ভারতবর্ষ বিজয় নর্মানদের ব্রিটেন বিজয়ের মত ছিল। তাঁরা দেশ জয় করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা যখন ভারত জয় করেন, তখন ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়েছে। দুই দেশের অর্থনীতি তখন আর একরকম ছিল না। ব্রিটেন তখন ভারতকে তার উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের বাঁধা বাজার হিসেবে গণ্য করতে লাগল। ভারতবর্ষ তখন এমন একটি শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হল, যাকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই হাতছাড়া করা যায়। সুতরাং তখন ভারতবাসীদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রকাশিত ব্রিটিশ শোষণ ও খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধতার এক বৎসর আগেই সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিল। বাঙালী ও ভারতীয়রা একে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম নামে অভিহিত করেন। আকাশে বাতাসে তখন স্বদেশানুরাগের বাণী প্রতিধ্বনিত।

যেহেতু পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী তৎকালীন স্বদেশপ্রেমের অর্থ ছিল খ্রীস্টান ধর্ম এবং পাশ্চাত্যীকরণের বিরুদ্ধতা ; অতএব একে উদ্দীপ্ত করার জন্য স্বভাবতই শুরু হল রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম এবং প্রাচীন ও জনপ্রিয় হিন্দু ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের পালা।

এখন রক্ষণশীল তৃতীয় দল গোঁড়া হিন্দু ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে নাম গ্রহণ করল ধর্মসভা। এই দল পুরোভাগে এসে হিন্দু বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করল। এদের পরিচালনার জন্য নেতাও এলেন—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের উদ্গাতা।

---

১. উইলিয়ম কেরী, 'কথোপকথন', ১৮০১, পৃ. ৫৮—৬০

২. T. W. Clark, *Prose Article*

৩. S. K. Das, *Early Bengali Prose : from Carey to Vidyasagar*, thesis : London University (SOAS), 1968, PP. 337—338

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'সীতার বনবাস', প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর—রচনাসম্ভার, কলিকাতা ১৩৬৪

৫. J. C. Ghose, *Bengali Literature*

৬. S. K. Das, PP. 240—241

৭. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ ১৬১—১৬২

৮. ঐ, পৃ. ১৭০

৯. S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta 1962, P. 578

১০. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নববাবু বিলাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ||৶

১১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৮, ভূমিকা, পৃ. ১

১২. ঐ, পৃ. ১২

১৩. ঐ, পৃ. ৩৯

১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা,' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ১৪—১৫

১৫. প্যারীচাঁদ মিত্র, 'আলালের ঘরের দুলাল', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ঢাকা ১৯৬৮, পৃ. ৮০—৮১

১৬. ঐ, পৃ. ১৬৫—১৬৬,

১৭. ঐ, পৃ. ১৭২

১৮. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩

১৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *'I', Early Poems*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'মধুসূদন কাব্য-গ্রন্থাবলী' ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ৬৮৯—৬৯০